#আমি পদ্মজা পর্ব ৬০

_____
ঘুম ভাঙতেই পদ্মজা হকচকিয়ে যায়। চোখের সামনে সব কালো। কালো রঙ ব্যাতীত কিছু নেই। ঘোর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। পদ্মজা চোখ কচলে আবার তাকায়। না,কিছুই পরিবর্তন হয়নি! সবকিছু কালো। বিকেলে সে বৈঠকখানার সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। তারপর নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুম ভাঙতেই দেখছে সব অন্ধকার! পদ্মজা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় দেয়ালের সুইচ। তখন সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে একটা আলো। আলোয় ভেসে উঠে আমিরের মুখ। পদ্মজা দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আমির পদ্মজার চেয়ে দুই হাত দূরে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি আবেগপ্রবণ। পদ্মজার

হৃদস্পন্দন থমকে যায়। কাচুমাচু হয়ে প্রশ্ন করল,'আপনি সব বাতি নিভিয়েছেন?'

আমির জবাব না দিয়ে হাতে থাকা সুন্দর কাচের হারিকেনটি পাশে রাখল। তারপরই পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার আগে পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। পদ্মজা আমতাআমতা করে শুধু বলতে পারল,'এ...এ...ই কি...কি?'

আমির তাদের নিজস্ব ঘরে নিয়ে আসে পদ্মজাকে। পদ্মজা ঘর দেখে অবাক হয়। ঘরের চারিদিকে অদ্ভুত সুন্দর কাচের ছোট হারিকেন। আর মাঝে এক ঝুড়ি পদ্মফুল! সময়টা শরৎকাল। দিনের বেলা শরতের সাদা মেঘ নীল আকাশে পাল তুলে, ছবির মতো ঝকঝকে সুন্দর করে তুলে আকাশ। কমে এসেছে যখন তখন বৃষ্টির জ্বালাতন। সময় বিল ঝিল ঝাপিয়ে শাপলা আর পদ্ম ফোটার। এতো পদ্ম ফুল দেখে মনে হচ্ছে বড় এক বিলের সব

পদ্ম ফুল তুলে নিয়ে এসেছে আমির। পদ্মজা প্রশ্ন করার পূর্বে আমির পিছন থেকে দুই হাতে পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল,'মনে আছে,প্রথম রাতে বলেছিলাম একদিন পদ্ম ফুল দিয়ে আমার পদ্মাবতীকে সাজাব! সময়টা নিয়ে এসেছি। দেখো তাকিয়ে।'

পদ্মজা ঝুড়ি ভর্তি পদ্ম ফুলগুলোর দিকে তাকায়। তার চোখ দুটি জলে ছলছল করে উঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমিরের দিকে চেয়ে আবেগমাখা কণ্ঠে বলল,'সে কথাটাও মনে রেখেছেন!'

উত্তরে আমির হেসেছিল। প্রথম রাতের চেয়ে কোনো অংশে কম সুন্দর ছিল না সেই রাত। পদ্মজা সেজেছিল পদ্ম ফুল দিয়ে। স্বামী যত্ন করে সাজিয়েছিল। সময়টাকে আরো সুন্দর করে তুলতে প্রকৃতি দিয়েছিল মৃদু শীতল বাতাস।

জানালা দিয়ে প্রবেশ করা বাতাসের দাপটে পদ্মজার ঘুম ছুটে যায়। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে আমিরকে খোঁজে। নেই,বিছানা খালি! আবার সে পুরনো দিনের আরেকটি সুন্দর মুহূর্ত স্বপ্নে দেখেছে। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠে। আজ পাঁচ দিন আমির নেই। তার কাছে তার স্বামী নেই। কোনো এক অজানা জায়গায় বন্দি হয়ে আছে। পদ্মজা এক হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। বালিশের উপর থাকা আমিরের শার্টটা হাতে নিয়ে চুমু খেল। তার চোখ দুটি আবার ভিজে উঠে। সেদিন রিদওয়ান, খলিল,মজিদ দ্বারা আহত হওয়ার পর তাকে ওখান থেকে কে এনেছে সে জানে না। চোখ খুলে ফরিনাকে দেখেছিল। তিনি ডুকরে কাঁদছেন আর চোখের জল মুছছেন। লতিফাকে জিজ্ঞাসা করে পদ্মজা জানতে পারে,সময়টা দুপুর । সর্বাঙ্গে তখন বিষধর

ব্যথা। উঠার শক্তিটুকু নেই। গলায় ব্যথা একটু বেশি ছিল। প্রথমে তার মাথায় আসে আমিরের কথা। রাতের ঘটনা মনে পড়তেই বুঝে যায়,এভাবে সে এদের সাথে পারবে না। তাকে তার মায়ের মতো শান্ত হতে হবে। সময়-সুযোগ বুঝে কাজ করতে হবে। ফরিনা আদর করে খাইয়ে দেন। তিনি পদ্মজার উপর করা নির্মম অত্যাচার আটকাতে পারেননি বলে বারবার ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি নাকি চেষ্টা করেছিলেন। কীরকম চেষ্টা করেছেন সেটা বলেননি। পদ্মজা জিজ্ঞাসাও করেনি। এরপর পদ্মজা কাঁপা হাতে পূর্ণাকে চিঠি লিখে,ফরিনার হাতে দেয়। তিনি যেন মগাকে দিয়ে দেন।

তারপরের দিনগুলো চুপচাপ কাটিয়ে দেয় পদ্মজা। আমিরের শোকে ভেতরে ভেতরে ঝড় বইলেও সামনে সে নিশ্চুপ থেকেছে। সুস্থ হওয়াটা আসল। নয়তো কাজের কাজ কিছুই

হবে না। উল্টো নর্দমার কীটগুলোর হাতে মরতে হবে। আমিরের জন্য দোয়ায় দুই হাত তুলে অঝোরে কেঁদেছে,যেন আমির ভালো থাকে। আর তার কাছে ফিরে আসে। খুব মনে পড়ে মানুষটাকে! হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে পদ্মজার। পদ্মজা আমিরের শার্ট বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। ফরিনা এসে দাঁড়ান দরজার সামনে। কেউ একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল হতেই,পদ্মজা হাতের উলটোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে তাকাল। ফরিনা ঘরে প্রবেশ করেন। গায়ে সাদা-খয়েরি মিশ্রণের শাল। পদ্মজা আমিরের শার্ট বালিশের উপর রেখে বলল,'আছরের আযান পড়েছে আম্মা?'

মৃদুল অন্দরমহলের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। তাকে মদন কিছুতেই অন্দরমহলে ঢুকতে দিচ্ছে না। গত চারদিন ধরে সে চেষ্টা

করছে অন্দরমহলে ঢোকার। গত তিন দিন ভুড়িওয়ালা একজন ঢুকতে দিত না। এখন দিচ্ছে না মদন। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে সে মৃদুলের সাথে তর্ক করছে। মৃদুল বলছে,'দুলাভাই ঢুকতে দেন কইতাছি। সমস্যাটা কিতা ঢুকলে? সেটাই তো বুঝতাছি না।'
'দেহো মৃদুল মিয়া এইডা আমার কথা না। মজিদ চাচার কথা। উনি কইছে বাড়ির ভিতরে নতুন কেউরে ঢুকতে না দিতে।'
'আমি তো আত্মীয় নাকি? আমার সাথে এমন করা হইতাছে কেন? আগে তো ঠিকই ঢুকতে দিত। এহন দেয় না কেন?'
'হেইডা তো আমি জানি না।'
'সরেন কইতাছি। নইলে ওইযে গাছের মোড়াডা ওইডা দিয়ে আবার মাথাডা ফাডায়া দিব। একবার মারছে আপাই এহন আমি মারাম।'

‘হেইডাই করো,তবুও আমি চাচার কথা অমান্য করতে পারতাম না।’
‘আমার কিন্তু কইলাম, রাগ উঠতাছে। মাটির তলায় গাইরালামু।’
‘মিয়া ভাই তুমি আমারে যা ইচ্ছা কইরালাও। আমি-

মৃদুলের মাথা বরাবরই চড়া! হুট করে খুন করার মতো রাগ চেপে যায় মাথায়। সে মদনের গলা চেপে ধরে। মদন কাশতে থাকল। আলো কান্না শুরু করে। আলোর কান্না শুনে খলিল বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সদর দরজার সামনে এমন দৃশ্য দেখে তিনি দৌড়ে আসেন। মৃদুলকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন। হুংকার ছাড়েন,’তোমার এতো সাহস কেমনে হইছে? আমার জামাইয়ের গলা চাইপা ধরো!’
মৃদুলের নাক লাল হয়ে গেছে রাগে। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। রাগী

মেজাজ নিয়েই দুই হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল,’ আপনার জামাই আমারে ভেতরে ঢুকতে দেয় না।’
‘তুমি মেহমান মানুষ, আলগ ঘরে থাকবা। এইহানে কী দরকার?’
‘এই নিয়ম কবে করছেন আপনেরা? আগের বার যখন ছিলাম তহন তো ঠিকই ঢুকতে দিছেন।’
‘এহন আর ঢুহন যাইব না। এইডা অন্দরমহল। বাড়ির বউ-ছেড়িদের জায়গা।’
‘সত্যি কইরা কন তো,বাড়ির ভিতর কী চলে?’
খলিলের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে,অসভ্য ছেলেটার কানের নিচে কয়টা দিয়ে দিতে। তিনি কটাক্ষ করে মৃদুলকে বললেন,’নিজের বাড়ি রাইখা এইহানে পইড়া রইছো কেন? মাইনষের অন্ন নষ্ট করতাছো। নিজের বাড়িত যাও।’

অপমানে মৃদুল বাকহীন হয়ে পড়ে! সে ক্ষণকাল কথা বলতে পারে না। তার আপন ফুফা এমন কথা বললো! ক্ষণমুহূর্ত পর সে জ্বলে উঠে বলল,'আপনের বাড়ির উপর থুথু মারি। আমি ব্যাঠা মিয়া বংশের ছেড়া। শত বিঘার মালিক আমি একাই। আপনের অন্নের ঠেকা পড়ে নাই আমার। আমার বাড়িত কামলাই আছে দশ-বারো জন। আমি কাইলই চইলা যাইয়াম বাড়িত।'

মৃদুলের আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না। সে ঘুরে দাঁড়ায়। কাছেই একটা বিরাট পাতিল ছিল। কোনো কাজে হয়তো বের করা হয়েছে। সে পাতিলে জোরে লাথি মেরে হনহন করে চলে যায়। পূর্ণা তার বোনের খবর নিয়ে দিতে বলেছে বলেই,সে বার বার অন্দরমহলে ঢোকার চেষ্টা করেছে। নয়তো মৃদুলকে কেউ একবার কোনো ব্যপারে না

করলে,সে দ্বিতীবারের মতো সেখানে ফিরেও তাকায় না।

পদ্মজার কথার জবাব দিলেন না ফরিনা। তিনি পদ্মজার পাশে গিয়ে বসলেন। পিছনে রিনু আসে। হাতে খাবারের প্লেট। তিনবেলা ফরিনাই খাইয়ে দিচ্ছেন। যত্ন নিচ্ছেন পদ্মজার। মায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম করছেন না। তবুও এই মানুষটা কোন কারণে সেদিন তার চিৎকার শুনেও বাঁচাতে যায়নি? ফরিনা প্লেট হাতে নিতেই পদ্মজা বলল,'আমি এখন মোটামুটি ভালোই আছি আম্মা। আমি খেয়ে নিতে পারবো। হাঁটতেও তো পারি।'
পদ্মজার এক কথায় খাবারের প্লেট পদ্মজার হাতে তুলে দিলেন ফরিনা। আর রিনুকে চলে যেতে বললেন। পদ্মজা চুপচাপ খেয়ে নেয়। তার খেতে ইচ্ছে করে না একদমই। কিন্তু সামনের যুদ্ধটার জন্য তার খেতেই হবে। তাকে

সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থতা ছাড়া যুদ্ধে সফল হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পদ্মজা খেল,ততক্ষণ ফরিনা পাশে বসে থাকলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা ফরিনাকে বলল,'আব্বাকে খুব ভয় পান আম্মা?'
ফরিনা স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন,'সব বউরাই স্বামীরে ডরায়।'
'না,আপনি একটু বেশি ভয় পান। যমের মতো।'
'কবিরাজের দেওয়া ঔষধডি খাও এহন।'
'আপনি কথা এড়াচ্ছেন আম্মা। আচ্ছা,ঔষধ দেন আগে।'
ফরিনা আলমারি খুলে ঔষধ বের করলেন। তারপর এগিয়ে দিলেন পদ্মজার কাছে। পদ্মজা ঔষধ খেয়ে বলল,'কবিরাজ আনার অনুমতি ওরা দিয়েছিল ভেবে আমি অবাক হয়েছি আম্মা! ওরা কেন চায়? আমি সুস্থ থাকি?'

ফরিনা কিছু বললেন না। পদ্মজা ফরিনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মানুষটার আয়ু কী শেষের পথে? কেমন যেন মৃত, মৃত ছাপ মুখে। চোখ বুজলে মনে হবে,অনেক দিনের উপোষ করে মারা গিয়েছেন। পদ্মজার মায়া হয় মানুষটার জন্য। কোন দুঃখে তিনি ধুঁকে,ধুঁকে মরছেন! পদ্মজা বিছানা থেকে নেমে এসে ফরিনার সামনে দাঁড়াল। বলল,'আম্মা, আপনি আমাকে নিজের মেয়ে ভেবে একটা আবদার রাখবেন?'
'তুমি তো আমার ছেড়িই।'
'তাহলে আবদার রাখবেন?'
'রাখাম।' ফরিনার শুষ্ক চোখ। অথচ গলা ভেজা মনে হলো!
পদ্মজা বলল,'তাহলে আপনার সব গোপন কথা আমাকে বলুন। যা ভেবে ভেবে আপনি কষ্ট পান।'

ফরিনা দুই হাতে পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু খান। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে পদ্মজার হাতে। মমতাময়ী স্পর্শ! পদ্মজার শরীরের
লোম খাড়া হয়ে যায়। ফরিনা বললেন,'তার আগে কও আমি সব কওয়ার পর তোমারে যা করতে কইয়াম তাই করবা তুমি।'
পদ্মজা অপলক নয়নে ফরিনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি করতে বলবেন তিনি? যদি সে সেটা করতে না পারে! সম্ভব না হয়! পদ্মজা বলল,'আপনি যা বলবেন আমাকে তার সাথে যদি যা করতে বলাটা মানানসই হয়,যুক্তিগত হয়। আমি তাই করব আম্মা।'
ফরিনা চোখের জল মুছেন। তারপর বললেন,'আমি বাবুর বাপরে দেইখা আইতাছি। তুমি শুইয়া থাকো।'

কথা শেষ করেই ফরিনা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যান। পদ্মজার মাঝে উত্তেজনা কাজ করছে। সে জানে না সে কী শুনতে চলেছে,তবে সেটা কোনো সাধারণ ঘটনা বা কথা হবে না এটা নিশ্চিত। সে ঘরে পায়চারি করতে করতে জানালার ধারে আসে। দেখতে পায় রিদওয়ানকে। হাতে একটা পলিথিন নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। এই জঙ্গলের মাঝেই তো আছে তালাবন্ধ রহস্যজাল। যার চাবি বোধহয় তার কাছে আছে। আলমগীরের দেয়া চাবিটাকে পদ্মজার কোনো তালাবন্ধ রহস্যজালের চাবি মনে হয়! রিদওয়ান গত দিনগুলোতে তিন-চার বার তাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু কিছু বলেনি। রিদওয়ানের মতিগতি বোঝা যায় না। অদ্ভুত সে। রিদওয়ানকে দেখলে পদ্মজার শরীর রাগে কাঁপে।
বেশ কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আসে কানে।

শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে পুরুষের পায়ের শব্দ। পদ্মজা দ্রুত এসে বিছানার এক কোণে বসে। যে কোণে ছুরি রাখা আছে। ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান। পদ্মজাকে দেখেই লম্বা করে হেসে বলল,'তারপর বলো কেমন আছো?'
পদ্মজার থেকে জবাব না পেয়ে রিদওয়ান আবার প্রশ্ন করল,'সুস্থ আছো তো?'
পদ্মজা সাড়া দিল না। রিদওয়ান চেয়ার টেনে বসল। বলল,'তোমাকে এত চুপচাপ দেখে অবাক হচ্ছি। কী পরিকল্পনা করছো বলোতো?'
পদ্মজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। বলল,'কাপুরুষ বোধহয় আপনার মতো মানুষকেই বলা হয়।'
রিদওয়ানের ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। তারপর হুট করেই হেসে দিল। বলল,' কাপুরুষের কী করেছি?'
'স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন। আবার সেই স্ত্রী অসুস্থ ছিল। এমন তো কাপুরুষরাই করে।'

‘এতো কথা না বলে চুপচাপ যা বলি শুনো। আমির আমাদের ব্যপারে অনেক নাক গলিয়েছে। অনেক সমস্যা করেছে। তবুও আমরা আমিরকে এক শর্তে ফিরিয়ে দেব। যদি তুমি সেই শর্ত মানো।’
‘কী শর্ত?’
‘তুমি আমিরকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে। কখনো অলন্দপুরে ফিরবে না।’
‘যদি না মানি?’
‘অবুঝের মতো প্রশ্ন করতে বলিনি। শর্ত দিয়েছি,মানা না মানা তোমার ব্যপার।’
‘আপনারা আমাকে ভয় পাচ্ছেন কেন?’
রিদওয়ান হাসল। পদ্মজা বলল,’সেদিন মেরে আধমরা করেছেন। এবার একদম মেরে দিন। তাহলেই আপনাদের সমস্যা শেষ। বেহুদা, আমাদের মুক্তি দিয়ে ভেজাল কেন বাড়াচ্ছেন? ঢাকা ফিরে গিয়ে পুলিশ নিয়েও তো আসতে

পারি।’
রিদওয়ান বিরক্তিতে ‘চ’ সূচক উচ্চারণ করল। বলল,’তোমাকে মারা যাবে না।’
‘আমাকে দিয়ে আপনাদের কী কাজ হবে যে মারা যাবে না?’
‘এতো প্রশ্ন কেন করছো?’
‘মনে আসছে তাই।’
রিদওয়ান রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে,’তুমি শর্তে রাজি নাকি না?’
‘আগে বলুন,কার কাজে আমি লাগব? কার খাতিরে আমাকে মারা যাবে না?’
‘তুমি শর্তে রাজি নাকি সেটা বলো। এইযে আমার পাঞ্জাবিতে তাজা লাল দাগটা দেখছো এটা কিন্তু রক্তের। আর রক্তটা আমিরের।’
পদ্মজার চোখ দুটি জ্বলে উঠে। এমনিতেই এই হিংস্র মানুষটার হাসি,কথা তার গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তার উপর তার স্বামীর রক্ত দেখাচ্ছে

রিদওয়ান। পদ্মজা উঁচু গলায় প্রশ্ন করল,'উনাকে জঙ্গলেই রেখেছেন তাই না?'
'শর্তে রাজি তুমি?'
'না।'
'তোমাকে তো আমি-
রিদওয়ান রেগে তেড়ে আসে। পদ্মজা পাশের টেবিল থেকে ঔষধের কাচের বোতলটা নিয়ে রিদওয়ানের মাথায় আঘাত করে। রিদওয়ান আকস্মিক আক্রমণে বিছানায় পড়ে যায়। পদ্মজা দ্রুততার সাথে ছুরি হাতে নেয়। রিদওয়ান বিছানায় পড়ার দুই সেকেন্ডের মধ্যে তার পিঠে ছুরি দিয়ে হেঁচকা টান মারে। রিদওয়ান আর্তনাদ করে উঠল। পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ছুরির আঘাত শরীরের মাংস অবধি চলে গিয়েছে। সুযোগ পদ্মজার হাতের মুঠোয়। সে এই সুযোগ হারাবে না। এতদিন সে এদের মানুষ ভেবে এসেছে। অথচ,এরা মানুষরূপী শয়তান। আর শয়তানকে বুঝেশুনে নয়,

ইচ্ছামত আঘাত করা উচিত। পদ্মজা দ্রুত কাঠের চেয়ার তুলে নেয় হাতে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে বারি মারে রিদওয়ানের মাথায়। রিদওয়ানের কানের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা নামে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে তার শরীর। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনীর মতো হাঁপাতে থাকে। মিনিট দুয়েক পর শাড়ির আঁচল মেঝে থেকে তুলে বুকে জরিয়ে নেয়। হুট করেই যেন শান্ত সমুদ্র গর্জন তুলে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে চারপাশ।

চলবে...